১ নক্ষত্ররাশি (The Stars)

যতদূর পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি যায় আমরা মাথার উপর দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ দেখতে পাই। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অনেক গ্রহ নক্ষত্র সম্মিলিত হয়ে তৈরী হয়েছে এক মহাকাশ।

কিন্তু এটাই কি সব? আমরা শুধু একটা সূর্য, একটা পৃথিবী এবং একটা চাঁদের কথাই জানি। কিন্তু তাছাড়াও মহাকাশে আরও অনেক গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্র আছে। তাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি কী? এমন আরও কিছু আছে কী যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না? আমাদের দৃষ্টির অগোচরে আরও অনেক গ্রহ, উপগ্রহ এবং অনুজ্জ্বল নিষ্প্রভ নক্ষত্র থাকতে পারে। তাদের সম্বন্ধে আমরা জানি কী?

১৬০৮ (1608) খ্রীষ্টাব্দে হল্যান্ডে টেলিস্কোপ নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে অনেক অনেক দূরের নিষ্প্রভ বস্তুও দেখতে পাওয়া যায় যা আমরা আগে খালি চোখে দেখতে পেতাম না।

১৬০৯ (1609) খ্রীষ্টাব্দে ইতালীদেশের বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (Galileo, Ga-lih-LAY-oh, 1504-1642) একটা ছোট টেলিস্কোপ তৈরী করেন। এই টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশে তিনি এমন অনেক নক্ষত্ররাশি দেখতে পেলেন যা এর আগে আর কেউ দেখতে পান নি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দূরবীন দিয়ে ছায়াপথ পর্যবেক্ষন করলেন। খালি চোখে ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গা বা স্বর্গগঙ্গার (milky way) দিকে তাকালে শুধুই আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধোঁয়াশার মতো নিষ্প্রভ আলোর বলয় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু গ্যালিলিও টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা দূরবীন দিয়ে ছায়াপথে অসংখ্য তারার সমাবেশ দেখতে পেলেন।

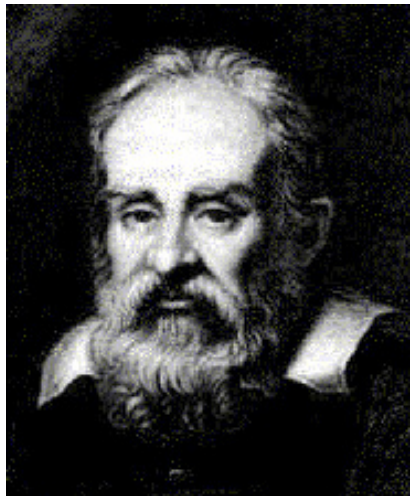

Galileo

সেই বছরই গ্যালিলিও দূরবীনের সাহায্যে বৃহস্পতি গ্রহের (Jupiter) চারিদিকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণরত আরও চারটে ছোট বস্তু দেখতে পেলেন। সেগুলি হল বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ। এ থেকেই প্রমাণিত হল যে, আমরা খালি চোখে মহাকাশে যা দেখতে পাই তাই সব নয়। তাছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে।

সুতরাং গ্যালিলিওর আবিষ্কারের ফলে এটাই প্রমাণিত হল যে, আমাদের সৌরজগতে (solar system) সূর্যকে প্রদক্ষিণরত গ্রহরাজি নিয়ে যে জগৎ তার বাইরেও এই মহাবিশ্বে আরও লক্ষ লক্ষ নক্ষত্ররাশি বিদ্যমান।

অবশ্য তাতে এটাও বোঝায় না যে, এই মহাবিশ্ব সুবিশাল। এমনও হতে পারে যে অন্যান্য নক্ষত্ররাজি আমাদের সৌরজগতের ঠিক পাশেই রয়েছে।

এখন এটাই প্রশ্ন যে, তাহলে এই সৌরজগত কতটা বড়?

১৬৭১ (1671) খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয়-ফরাসী মহাকাশ বিজ্ঞানী গিওভান্নী ডি কাস্যিনি (Giovanni D. Cassini–ka–SEE-nee, 1625-1712) সর্বপ্রথম মঙ্গল গ্রহের (Mars) দূরত্ব নির্ণয় করেন। তারপরেই সৌরজগতের অপর সব গ্রহের দূরত্বও নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

কাস্যিনির হিসাব প্রায় সঠিকই হয়েছিল। পরে তার উত্তরসুরী অপরাপর মহাকাশ বিজ্ঞানীরা কাস্যিনির হিসাব সামান্য সংশোধন করেন। এর ফলে আমরা এখন জানি যে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯৩,০০০,০০০ মাইল (93,000,000 miles), যা কাস্যিনির পূর্বসূরি বিজ্ঞানীদের ধারণার থেকে অনেক বেশী দূরত্ব।

সূর্যকে প্রদক্ষিণরত অনেক গ্রহেরই দূরত্ব সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় অনেক বেশি। কাস্যিনির সময়ে জানা ছিল যে শনি গ্রহই (saturn) সূর্যের দূরতম গ্রহ, সূর্য থেকে যার দূরত্ব ৮০০,০০০,০০০ মাইল (800,000,000 miles) এরও বেশী।

তাহলে অবশ্য ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ''ব্রহ্মাণ্ড বদ্ধ''। তারপরে আমরা আবার আবিষ্কার করতে ব্যাপৃত থাকব যে এই বদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ''দোদুল্যমান'' কি না?

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আবিষ্কারের শেষ নেই। ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় সব জিজ্ঞাসার উত্তর যদি পাওয়া হয়ে যায় তবে বিজ্ঞানীদের ও আমাদেরও হতাশ লাগবে এই ভেবে যে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের জানার আর কিছু বাকি নেই।

—:—

হবে। ব্রহ্মাণ্ড তখন ''বদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডে'' (closed universe) পরিণত হবে।

যদি ব্রহ্মাণ্ড সত্য সত্যই ''বদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডে'' পরিণত হয় তবে হয়তো এটাই ঠিক যে কোন বস্তু ব্যতিতই ''মহাজাগতিক বিস্ফোরণ'' সম্ভব হয়েছে এবং ''মহাচূর্ণনে''র ফলে ব্রহ্মাণ্ড আবার শূন্যে ফিরে যাবে। অথবা এমনও হতে পারে ''মহাচূর্ণনের'' ফলে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে সবেগে ফিরে আসার জন্য আবার নতুন ''মহাজাগতিক বিস্ফোরণ'' ঘটবে। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ: প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হতে থাকবে। ফলে ''দোদুল্যমান ব্রহ্মাণ্ডে'' (oscillating universe) পরিণত হবে।

তাহলে ব্রহ্মাণ্ড মুক্ত না বদ্ধ? যদি এটা ''বদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড'' হয়, তাহলে কি এই ব্রহ্মাণ্ড একবারই মাত্র তৈরী হয়েছে, নাকি এই ব্রহ্মাণ্ড ''দোলায়মান ব্রহ্মাণ্ড'' ?

মহাকাশ গবেষকগণ কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। এই ব্রহ্মাণ্ড কী আবহমান কাল ধরে প্রসারিত হতে থাকবে? না কি কোন একসময় এই প্রসারণ থেমে গিয়ে ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হতে থাকবে? এটা নির্ভর করবে ব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কত বেশি। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান কত বেশি সেটাও নির্ভর করবে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে মহাজাগতিক বস্তুর পরিমাণ কত। সেটা নির্ভর করবে এই ব্রহ্মাণ্ডে কত ছায়াপথ, নক্ষত্র এবং আরও ভার যুক্ত পদার্থ বিদ্যমান। যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তবর্তী গোলাকার পিণ্ড সকলকে নিষ্পেষণ করে একত্রিত রয়েছে।

আমরা যদি শুধু ছায়াপথ এবং নক্ষত্রদের নিয়ে বিচার করি তাহলে এই ব্রহ্মাণ্ডের বৃদ্ধি প্রাপ্ততা রোধের জন্য যে ভর এবং ভারের প্রয়োজন তার একশো ভাগের মাত্র এক ভাগ হবে। তাই যদি হয় তবে এই ব্রহ্মাণ্ড ''মুক্ত ব্রহ্মাণ্ড'' ।

কোন কোন মহাকাশ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, তাহলে এই ব্রহ্মাণ্ডে নিশ্চয়ই এমন কিছু ''ভর'' (mass) রয়েছে যাদের আমরা বিবেচনার জন্য গ্রাহ্য করি না। (এদের বলা হয় হারিয়ে যাওয়া ভর-missing mass)। ছায়াপথের বাইরেও এরকম ভরযুক্ত বস্তু থাকতে পারে। হতে পারে ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু ক্ষুদ্র বস্তু আছে যাদের কোন ভর নেই বলে আমরা মনে করি, কিন্তু আদতে তাদের ভর আছে।

বিজ্ঞানী কাস্যিনির পরবর্তী সময়কালের আবিষ্কারে অবশ্য আরও কয়েকটি সূর্যকে প্রদক্ষিণরত দূরবর্তী গ্রহের খোঁজ পাওয়া গেছে। সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী গ্রহের নাম প্লুটো (Pluto)। সূর্যকে প্রদক্ষিণরত প্লুটোর উপবৃত্তাকার (ellipse) পার্শ্বিক (Side to Side) গতিপথের দূরত্ব ৭,০০০,০০০,০০০ মাইল (seven billion miles)

এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, এই মহাকাশের পরিধি অসীম। সাতশো কোটি মাইল দূরত্বের প্লুটোর থেকেও আরও দূরে আরও অনেক বিশালাকার উজ্জ্বল নক্ষত্র এই মহাবিশ্বে বিরাজমান।

Solar System

কতিপয় মহাকাশ বিজ্ঞানী এই ধারণা পোষণ করেন যে, আকাশে আমরা যে সকল আলোকজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দেখতে পাই তাদের দূরত্ব আরও অনেক বেশী। যে সকল অনুজ্জ্বল নক্ষত্র আমরা আকাশে দেখতে পাই তারাও প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট উজ্জ্বল, কিন্তু তাদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে আরও অনেক বেশী বলে তাদের নিষ্প্রভ মনে হয়। পৃথিবীর নিকটতম প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র সূর্য। সুতরাং যে সকল নক্ষত্র আমরা আকাশে দেখতে পাই তাদের দূরত্ব সূর্যকে প্রদক্ষিণরত দূরতম গ্রহ প্লুটোর থেকেও অনেক অনেক দূরে।

তাহলে কী এই সকল গ্রহ নক্ষত্রের সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব? না কি

মহাকাশ বিজ্ঞানীদের চিরকাল শুধুমাত্র অনুমানের উপরই নির্ভরশীল হতে হবে?

খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০ বছর আগে গ্রীক মহাকাশ বিজ্ঞানী আকাশে অবস্থিত কোন কিছুর দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য এক পদ্ধতি নিরূপণ করেন। সেই পদ্ধতির নাম প্যারালাক্স (Parallax—PA-ruh-laks)।

প্যারালাক্স পদ্ধতিতে আকাশে অবস্থিত কোন বস্তুর সঠিক অবস্থান নিরূপণ করার জন্য পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর যে কোন দুটি স্থান থেকে আকাশে অবস্থিত ওই বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে।

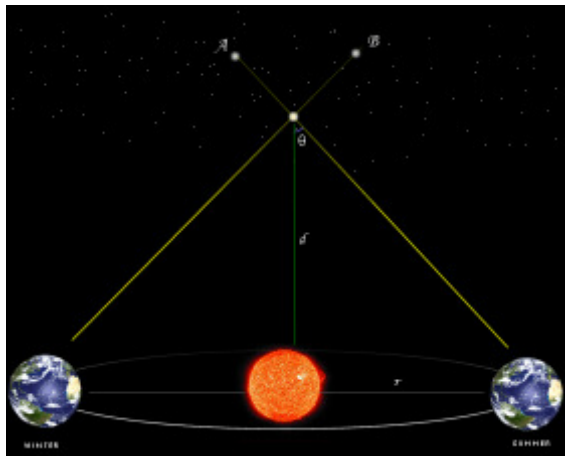

Parallax

✶ [Parallax—বিভিন্ন কোণ থেকে দেখলে গ্রহ নক্ষত্রাদির যে পরিবর্তন ঘটে বলে মনে হয়।]

এই পদ্ধতি ঠিক কিভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য আমরা একটা সাধারণ পরীক্ষা করতে পারি। দেওয়ালে অবস্থিত একটি ছবির সামনে দাঁড়াও। তোমার হাতের একটি আঙ্গুল তোমার মুখের সামনে ধরো। এবার বাঁ চোখ বন্ধ করে আঙ্গুলটি তোমার ডান চোখ দিয়ে দেখো, লক্ষ্য করে দেখবে তোমার আঙ্গুলটিকে ছবিটির কাছে অবস্থিত মনে হচ্ছে। এবার তোমার আঙ্গুল ও মাথা স্থির রেখে ডান চোখ বন্ধ করে বাঁ চোখ দিয়ে দেখো। দেখবে যে, আঙ্গুলটির অবস্থান ছবিটির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

(continuous creation) ধারণা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে গেলো।

যদি আমরা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তবে দূরতম যে কোয়াসারটিকে (quasar) *[Quasar-Quasic stellar radio source-distant active galactic nucleus–বহু দূরবর্তী অত্যন্ত উজ্জ্বল ছায়াপথ] দেখি তা ১০,০০০,০০০,০০০ (ten billion) আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। তার থেকে উৎপন্ন যে আলো আমরা দেখতে পাই তা তাহলে নিশ্চয়ই একশো কোটি (ten billion) বছর আগের বিকিরিত আলোক রশ্মি। সেই আলো নিশ্চয়ই ''মহাজাগতিক বিস্ফোরণের বহুদিন পরে বিকিরিত আলোক-রশ্মি নয়। এর থেকে দূরে অবস্থিত কোন কোয়াসার কী আমরা খোঁজ করতে পারব? মনে হয় না। দূরতম কোয়াসারের পরে অস্পষ্ট কুয়াশা (haze) দেখতে পাওয়া যায়। যা মহাজাগতিক বিস্ফোরণের সময় উদ্‌গত উষ্ণ বিকিরণের ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে। এই মহাজাগতিক বিস্ফোরণ সম্ভবত বারোশ বা পনেরোশো কোটি (twelve or fifteen billion) বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

তাহলে ভবিষ্যতে আর কি ঘটতে চলেছে?

একটা সম্ভাবনা যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চিরকাল ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়ে যাবে। এখন থেকে তিন হাজার কোটি (trillions of years) বছর পরেও ছায়াপথরা ক্রমশ অপসৃত হতে থাকবে। স্থানীয় দলভুক্ত ছায়াপথ ব্যতিত বাকি সব ছায়াপথই এত দূরে সরে যাবে যে কোন যন্ত্রের সাহায্যে আর এদের দেখা যাবে না। তবে প্রমাণ হবে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড ''মুক্ত ব্রহ্মাণ্ড'' (open universe) ।

অবশ্য এই ছায়াপথগুলি যারা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকর্ষণ করছে। এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যা ব্রহ্মাণ্ডকে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করছে তা সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পাবে। ফলে এটাই সম্ভাব্য ঘটনা যে, এই ক্রমবর্ধমানতার গতি ধীরে ধীরে কমতে কমতে ''শূন্য'' মান হয়ে যাবে। ফলে ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবর্ধমানতা থেমে যাবে। আবার খুব ধীরে ধীরে ব্রহ্মাণ্ড সংকুচিত হতে শুরু করবে। ক্রমশ ব্রহ্মাণ্ডের সংকোচনের গতি বাড়তে থাকবে যতদিন না সব ছায়াপথ একত্রিত হয়ে একটা ''মহা চূর্ণন'' (Big crunch) সংঘটিত

বিজ্ঞানী গ্যামো (Gamow) ভেবেছিলেন যে, যদি এই বিকিরণ তরঙ্গকে কোন পদ্ধতিতে নিরূপন করা যায় তবে আকাশের পশ্চাদ্‌পটে নিশ্চয়ই খুব সামান্য হলেও এই বিকিরণ তরঙ্গকে খুঁজে পাওয়া যাবে। অতঃপর দূরবীণের সাহায্যে মহাকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখা গেছে যে, আমরা যত দূরে পৌঁছাতে পারি, এই বিকিরণ তার থেকেও অনেক দূরে প্রবাহিত হচ্ছে। মহাকাশে আরও অনেক দূরত্বে যদি পৌঁছানো যায় তবে সেই বিকিরণের কাছে পৌঁছানো যাবে যা মহাবিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন হয়েছিল। এই বিকিরণকে অনুভব করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট দিক নেই। মহাকাশের যে কোন দিকে বহু দূরে উপস্থিত হলে ''মহা বিস্ফোরণের'' প্রমান পাওয়া যাবে। এই ''বিকিরণ তরঙ্গ'' সব দিক দিয়েই একই সময়ে ও একই ভাবে আমাদের কাছে পৌঁছাবে। অতীতের সেই মহা বিস্ফোরণের শব্দ ''বিকিরণ তরঙ্গে''র মাধ্যমে আমাদের কাছে ''ফিস্ ফিস্'' (whisper utter with a low sound) করে পৌঁছাবে।

বিজ্ঞানী গ্যামোর সময়ে, এই 'ক্ষীণ বিকিরণ তরঙ্গ সংকেত' গ্রহণ করার মতো কোনও যন্ত্র ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ আরও অনেক অনেক উন্নত ''বিকিরণ দূরবীক্ষণ'' (radio telescope) যন্ত্র প্রস্তুত করেছেন যা এই বিকিরণ তরঙ্গকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। একজন আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী রবার্ট এইচ. ডিক (Robert H. Dicke-Dik-ee 1916—) বিজ্ঞানী গ্যামোর আবিষ্কৃত এই ''বিকিরণ তরঙ্গ''কে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে এই ''বিকিরণ তরঙ্গ'' সংকেত অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বিজ্ঞানী আর্নো এ. পেনজিয়াস (Arno A. Penzias–PEN-zee-us, 1933—) এবং রবার্ট ডব্লু. উইলসন (Robert W. Wilson 1936—) ''বিকিরণ তরঙ্গ'' চিহ্নিত করার খোঁজে একটা অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র প্রস্তুত করেন। শীঘ্রই তারা বিজ্ঞানী গ্যামোর ধারণা অনুযায়ী ''বিকিরণ তরঙ্গ সংকেতে''র খোঁজ পেলেন।

তারপর থেকে অনেক মহাকাশ বিজ্ঞানী এই ''বিকিরণ তরঙ্গ সংকেত'' সম্বন্ধে আরও গভীর তথ্য সংগ্রহ করলেন। ফলে এই ধারণা সত্য প্রমাণিত হলো যে, ''মহাজাগতিক বিস্ফোরণ'' অবশ্যই ঘটেছিল। ফলে ''অবিচ্ছিন্ন জগৎ সৃজন তত্ত্ব''

এই স্থান পরিবর্তনের পরিমাপ নির্ভর করবে তোমার চোখ ও আঙ্গুলের মধ্যে দূরত্বের উপরে। (এই পরীক্ষাটি তুমি নিজে নিজে করে দেখতে পার।) তোমার চোখের থেকে আঙুলের দূরত্ব যতবেশী হবে এই স্থান পরিবর্তনের পরিমান ততই কম হবে। তোমার চোখের থেকে বহু দূরের কোনো কিছুর জন্য তুমি কোনো স্থান পরিবর্তনই দেখতে পাবে না।

তাই এই PARALLAX পদ্ধতিতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য দুটি পর্যবেক্ষণ স্থানের দূরত্ব বেশী হওয়া প্রয়োজন।

এই পদ্ধতিতে আকাশের কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের দূরত্ব পৃথিবী থেকে কতটা তা নির্ণয় করার জন্য দুটি পর্যবেক্ষণ স্থলের দূরত্ব কয়েকশো মাইল হওয়া প্রয়োজন। তাহলে অন্য নক্ষত্রের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সেই নির্দিষ্ট নক্ষত্র বা গ্রহের অবস্থানের সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। এই আপাত অবস্থান পরিবর্তন এবং পর্যবেক্ষণ স্থলের দূরত্বের পরিমাপ করে আকাশে অবস্থিত গ্রহ বা নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

কিন্তু সমস্যা এটাই যে পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রটির দূরত্বও এত বেশী যে এই পদ্ধতিতে তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান মহাকাশ গবেষক ফ্রেডরিক ডব্লু বেসেল (Friedrich W.Bessel–BES-ul, 1784-1846) পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রটির অবস্থান প্যারালাক্স পদ্ধতিতে নিরূপণ করতে সমর্থ হন। অতঃপর অপর বিজ্ঞানীরা আরও অনেকগুলি পৃথিবীর নিকট নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে সক্ষম হন। তখন দেখা যায় যে এই সকল নক্ষত্রদের পৃথিবী থেকে দূরত্ব প্লুটোর মত কয়েকশো লক্ষ মাইল নয়, কয়েক হাজার লক্ষ মাইল।

এখন আমরা জানি যে, সূর্য ব্যতিত পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রটির নাম প্রক্সিমা সেন্টুরী (Proxima Centauri-PROX-ce-ma sen-TAW-ree) এবং তার দূরত্ব ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল (twenty-five thousand billion miles)।

সূর্য ব্যতিত এইটিই পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র। মহাকাশে এইরকম আরও অনেক নক্ষত্র আছে—কিন্তু তাদের দূরত্ব আমাদের থেকে প্রক্সিমা সেন্টুরীর দূরত্বের

থেকে অনেক অনেক বেশী।

এই রকম কয়েকশো হাজার কোটি মাইল দূরত্ব নির্ণয় করা খুব অসুবিধা, প্রতিটি সংখ্যায় এতগুলো শূন্য আমাদের হতবাক করে দেয়। তাই মহাকাশবিজ্ঞানীরা আর একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। প্রতিটি নক্ষত্রই সূর্যের মতো আলোক বিচ্ছুরণ করে। সেই পদ্ধতির মূল তত্ত্ব আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণের উপর ভিত্তি করে।

আমরা জানি আলোর গতি সর্বাপেক্ষা বেশী। একটা টর্চ জ্বালালে সেই আলোকরশ্মি এক সেকেণ্ডে ১৮৬,২৮২ মাইল (186,282 miles) গতিতে ছড়িয়ে পরে। ১$^{১}/_{৪}$ সেকেন্ডে ($1^{1}/_{4}$ seconds) পৃথিবী থেকে আলো চাঁদে পৌঁছে যেতে পারে। ৮ মিনিটে (8 minutes) সূর্যের আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ৯৩,০০০,০০০ মাইল (93,000,000 miles)।

তাহলে এক বছরে একগুচ্ছ আলোকরশ্মি কতদূরে যেতে পারে?

১ বছর = ৩১,৫৫৭,০০০ সেকেন্ড। এক সেকেন্ডে আলোকরশ্মি ১৮৬,২৮২ মাইল যায়। সুতরাং এই দুটি সংখ্যাকে গুণ করা যাক।

৩১,৫৫৭,০০০ x ১৮৬,২৮২ মাইল = ৫,৮৮০,০০০,০০০,০০০ মাইল/বছর। তাহলে বলা যায় যে, এক বছরে আলোক রশ্মি ৬ হাজার কোটি মাইল (six thousand billion miles) যেতে পারে। এক বছরে আলোক রশ্মি যতদূর যেতে পারে তাকে বলা হয় আলোকবর্ষ (Light Year)।

আমরা জানি সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্য থেকে আলোক রশ্মি ৮ মিনিটে পৃথিবীতে পৌঁছায়। আর সূর্য ব্যতিত নিকটতম নক্ষত্র Proxima Centauri থেকে আলোক রশ্মি ৪.৪ আলোকবর্ষে পৃথিবীতে পৌঁছায়। এই নক্ষত্রটির থেকে যে আলোক রশ্মি আমরা দেখতে পাই তা ৪.৪ আলোকবর্ষ (4.4 light year) আগে বিস্তারিত হয়েছে। এই হিসাব থেকে আমরা এই নক্ষত্রটির দূরত্ব সহজেই ধারণা করতে পারি।

আমেরিকার অল্পকিছু অংশের লোক প্রক্সিমা সেন্টুরী নক্ষত্রটিকে দেখতে পায়। এটি আকাশের এতটাই দক্ষিণ দিকে অবস্থিত যে উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত ফ্লোরিডা থেকে এই নক্ষত্রটি দৃশ্যমান হয় না।

জাগতিক বিস্ফোরণ' ১০,০০০,০০০,০০০ (10 billion) বৎসর আগে ঘটেছে। কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন মহা জাগতিক বিস্ফোরণের বয়স ২০,০০০,০০০,০০০ (20 billion) বছর। আমরা একটা মধ্যবর্তী সংখ্যা নিতে পারি যে, মহাজাগতিক বিস্ফোরণের বয়সকালে ১৫,০০০,০০০,০০০ (Fifteen billion) বছর।

কিছু মহাকাশ বিজ্ঞানী অবশ্য মনে করেন যে, আদৌ 'মহাজাগতিক বিস্ফোরণ' বলে কোন ঘটনা ঘটেনি। তারা মনে করেন যে, যদিও ছায়াপথরা সবাই নিজেদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে তাহলে সম্ভবত মহাকাশে ধীরে ধীরে নতুন ''শিশু ছায়াপথ'' তৈরী হচ্ছে।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ মহাকাশ বিজ্ঞানী ফ্রেড হোলে (Fred Hoyle, 1915 –) এবং দুজন অস্ট্রেলিয়া বিজ্ঞানী হারম্যান বন্ডি (Hermann Bondi, 1919 –) এবং থমাস গোল্ড (Thomas Gold, 1920 –) মহাকাশের ''অবিচ্ছিন্ন জগৎ সৃষ্টি তত্ত্ব'' (Continuous creation) ব্যাখ্যা করেন। যদি এই ''অবিচ্ছিন্ন জগৎ সৃজন তত্ত্ব'' সঠিক হয় তবে মনে হয় আমরা পিছন ফিরে যতদূর সম্ভব যেতে পারবো। তাহলে ধরে নেওয়া যাবে এর কোন শেষ ও নেই কোন শুরুও নেই।

''অবিচ্ছিন্ন জগৎ সৃজন তত্ত্ব'' ধারণা যখন মেনে নেওয়া হয়েছে তখন বিজ্ঞানী গ্যামো ''মহাজাগতিক বিস্ফোরণের'' দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি বললেন, যখন ''মহাজাগতিক বিস্ফোরণ'' ঘটেছিল তখন হয়তো ব্রহ্মাণ্ড খুব ছোট ছিল, কিন্তু এই মহাবিস্ফোরণ লক্ষ্য কোটি (trillons of trillions) ডিগ্রী তাপ বিকিরণ করেছিল। এই মহাবিশ্ব যত বর্ধিত হতে লাগলো এই তাপ বিকিরণ ও ছড়িয়ে পরতে লাগলো, ফলে তাপমাত্রা হঠাৎ কমে গেল।

এখন, মহাজাগতিক বিস্ফোরণের সহস্র কোটি বছর পরে প্রকৃত পক্ষে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তাপমাত্রা অনেক কমে গেছে। যখন ব্রহ্মাণ্ড অনেক উত্তপ্ত ছিল তখন তাপ বিকিরণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক ছোট ছিল এবং তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে তাপ বিকিরণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটাই বর্তমান সময়ে মহাজাগতিক ''বিকিরণ তরঙ্গ'' (radio - waves)-এ পরিণত হয়েছে।

ব্রহ্মাণ্ড দ্রুত বর্ধিত হলে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে সময় কম লেগেছে, ধীরে বর্ধিত হলে সময় বেশি লেগেছে। ব্রহ্মাণ্ডের বর্ধিত হওয়ার গতির উপর মহাজাগতিক বিস্ফোরণের সময়কাল নির্ভর করছে।

আমরা ফিরে যাই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। যখন বিজ্ঞানী হাব্‌ল ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবর্ধমানতার গতির আনুপাতিক হারকে 'হাব্‌ল ধ্রুবক' (Hubble Constant) আখ্যা দেন। এই 'ধ্রুবক' যত বড় হবে ব্রহ্মাণ্ড তত দ্রুত বর্ধিত হয়েছে ও তত কম সময় লেগেছে এবং 'মহা বিস্ফোরণে'র সময়ও তত কম হবে। 'হাব্‌ল ধ্রুবক' এর মান অনুযায়ী ২,০০০,০০০,০০০ (two billion) বছর আগে মহা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের বয়সও দুশো কোটি বছর।

ভু-বিজ্ঞানীগণ (geologist) এই তথ্যে আশ্চর্যান্বিত হল। তাদের মতে পৃথিবীতে এমন অনেক পাহাড় আছে যার বয়স তিনশো কোটি (three billion) বছর। তাদের মতে ধূলোর মেঘ এবং বায়বীয় গ্যাস দ্বারা সৃষ্ট আমাদের সৌরজগৎ ৪,৬০০,০০০,০০০ (4.6 billion) বছর আগে তৈরী হয়েছে। কী করে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের সৌরজগতের বয়স বেশি হবে?

কুড়ি বছরের বেশি সময় ধরে এই ধাঁধাঁর নিষ্পত্তি হয়নি। মহাকাশ বিজ্ঞানী না কি ভূতত্ত্ববিদ্—কারা সঠিক?

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মহাকাশ বিজ্ঞানী ''বাদ্‌দে'' দু-ধরণের 'সেফিডস্' নক্ষত্রের সন্ধান পান। তাতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সময়কাল নিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের গবেষণা ভুল। সেফিডস্ নক্ষত্রের সাহায্যে নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ধারণের নিয়মের নতুন পদ্ধতি প্রমাণ করে যে পূর্বতর বিজ্ঞানীদের গণনার থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আরও অনেক অনেক বৃহৎ। সুতরাং ''হাবল্ ধ্রুবক'' এর মান যা ভাবা হয়েছিল তার থেকে অনেক কম। ফলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান আয়তনে পরিণত হতে আরও বেশি সময় লেগেছে এবং ''মহাজাগতিক বিস্ফোরণ''-এর সময়কাল অনেক বেশি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবশ্যই আমাদের সৌর জগতের থেকে অনেক বেশি বয়স্ক। কিন্তু কত তা এখনও জানা যায়নি। অনেক মহাকাশ বিজ্ঞানী মনে করেন এই 'মহা

উত্তর আকাশের রাতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির নাম সিরিয়াস (Sirius-SIR-ee-us)। এই নক্ষত্রটি ৮.৬৩ আলোকবর্ষ (8.63 light year) দূরে হলেও এটিও পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আর্কটুরাস (Arcturus-ahrk-Too-rus) ৪০ আলোকবর্ষ (40 light year) দূরত্বের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

মহাকাশ গবেষকগণ এইভাবে এমন দূর থেকে দূরতম নক্ষত্রের পৃথিবী থেকে দূরত্ব নির্ণয় করে চলেছেন।

ওরিয়ন (Oh-RYE-on) নক্ষত্রপুঞ্জের (constellation) একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র রিজেল (Rigel-RYE-jel), এটি পৃথিবী থেকে ৫৪০ আলোকবর্ষ (540 Light Year) দূরত্বে অবস্থিত। এটি Proxima Centauri নামক নক্ষত্র থেকে একশো কুড়ি গুণ দূরত্বে অবস্থিত, তবুও এটি পৃথিবী থেকে দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল নক্ষত্রদের দূরত্ব এত বেশী যে প্যারালাক্স পদ্ধতিতে এদের দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।

এইসকল আবিষ্কারের ফলে ১৮৫০ (1850) খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ধারণা করা হয় যে আমাদের এই মহাবিশ্ব অসীম।

*[আমরা পৃথিবীতে বাস করি। পৃথিবী একটি গ্রহ। সূর্য একটি বিশাল আলোকজ্জ্বল নক্ষত্র। পৃথিবী এবং আরও আটটি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। চাঁদ পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ। চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। অন্যান্য গ্রহেরও উপগ্রহ আছে। রাতের আকাশে আমরা যে আলোকোজ্জ্বল বস্তু দেখতে পাই, তাদের নক্ষত্র বা তারা বলে। এই প্রতিটি নক্ষত্র সূর্যের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, তাই এদের এত ছোট দেখায়।]

—:—

২ ছায়াপথ (The Galaxy)

এই মহাবিশ্ব কত বড়? আমাদের মাথার উপর ছড়িয়ে থাকা এই যে তারকাসমৃদ্ধ আকাশ তার কী কোন শেষ নেই? এই নিখিল বিশ্ব কী সত্যই অসীম ["Infinite" (In-fih-nit) from Latin words "without end".]

অনেক মহাকাশ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, হয়তো তা নয়। কারণ গ্যালিলিও আকাশে যে ছাযাপথ দেখেছিলেন সেটাই হয়তো অগুন্তি নিষ্প্রভ নক্ষত্রের সমাবেশে তৈরী হয়েছে।

ছায়াপথে অসংখ্য নক্ষত্রের সমাবেশে একটা আলোর কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। ছায়াপথের অপরদিকে হয়তো বেশী নক্ষত্র নেই। এটাই আগেকার বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন। কারণ তারা তখনও আকাশের বিশাল দূরত্ব পর্যন্ত দেখতে পাননি।

একজন জার্মান-ইংরেজ বিজ্ঞানী এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। তার নাম উইলিয়াম হারসেল (William Herschel - HER-shel, 1738 - 1822) তিনি ১৭৮৪ (1784) খ্রীষ্টাব্দে এই ছায়াপথের নক্ষত্রের সংখ্যা গণনার কাজ শুরু করেন।

তিনি আকাশের এক এক দিকের নক্ষত্র গণনা করতে শুরু করেন।

অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই এত অসংখ্য নক্ষত্র তিনি গণনা করে শেষ করতে পারেননি। দূরবীণের সাহায্যে তিনি আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র দেখতে পেলেন যা গণনা করাও অসীম কার্য। এবার তিনি ছোট ছোট ভাবে দলবদ্ধ করে নক্ষত্র গণনা করতে শুরু করেন। এইভাবে তিনি একই মাপ ধরে মাত্র ৬৮৩টি দল সনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

ছায়াপথে পৃথিবীর নিকটতম দলবদ্ধ নক্ষত্রের পরিসংখ্যান তিনি করেছিলেন। সুদূর ছায়াপথের দূরের নক্ষত্র সংখ্যাও যতদূর সম্ভব তিনি গণনা করেছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ড এখন ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছে।

একজন রাশিয়ান আমেরিকান বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো (George Gamow, 1904-68) এই মতবাদ সমর্থন করেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের এই বিস্ফোরণকে ‘‘মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব’’ বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে এই বিস্ফোরণই মহাজাগতিক বিশ্ব সৃষ্টির আদি কারণ।

তাহলে কত দিন আগে এই মহাজাগতিক বিশ্ব সঙ্কুচিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড রূপে ছিল? কবে এই মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল? আমাদের এই বিশ্বের বয়স কত?

এটা নির্ভর করছে যে এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।

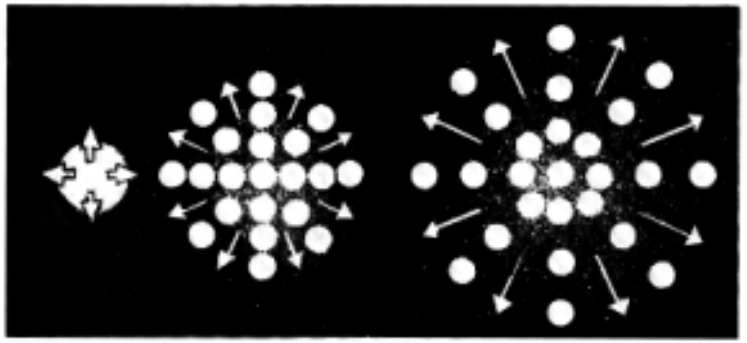

THE BIG BANG

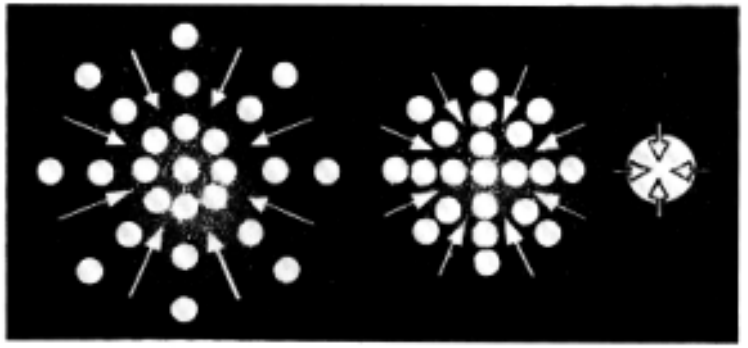

THE BIG CRUNCH

৫ মহা জাগতিক বিস্ফোরণ তত্ত্ব (The Big Bang)

এক মুহূর্তের জন্য ধরে নেওয়া হলো যে, ব্রহ্মান্ড ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছে। তাহলে, ব্রহ্মান্ড গত বছর যত বড় ছিলো এই বছর তার থেকে বড় হয়েছে। গত বছর তার আগের বছর থেকে বড় হয়েছে — এই ভাবে বিগত বছরের থেকে প্রতি বছরই বড় হয়েছে এবং এভাবেই চলছে।

এখন যদি আমরা উল্টো দিক থেকে বিচার করি, তবে বিগত বছরে ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হতে হতে এমন কোন সময়ে পৌঁছে ছিল যখন কিছুই ছিল না।

বেলজিয়ামের মহাকাশ বিজ্ঞানী জর্জেস ই. লামেটরা (Georges E. Lemaitre-luh-MET-ruh, 1894-1966) প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্কোচন বিষয়ক তথ্য বলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বলেন যে, অনেক অনেক বছর আগে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু একত্রিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র বস্তু রূপে ছিল, তিনি সেই বস্তুটিকে ‘‘ব্রহ্মাণ্ড’’ (cosmic egg) নামকরণ করেন।

*[Cosmic egg–A word ‘‘cosmic egg’’ is a mythological motif found in the certain myths of many cultured civilisation. The earliest ideas of egg shaped cosmos comes from some of the sanskrit scripture based on sanskrit term for it is ‘Brahmanda’, ‘Brahm’ means ‘cosmos’ and ‘anda’ means egg. The Rig-Veda uses a similar name for the source of the universe ‘‘Hiranya garbha’’ which literary means ‘‘golden womb’’. — বৈদিক যুগে ঋক্ বেদে আমরা এই ‘‘ডিম্বাকৃতি ব্রহ্মাণ্ড’’ শব্দটি পাই যাকে ‘‘হিরণ্য গর্ভ’’ ও বলা হয়ে থাকে।]

তিনি ভেবেছিলেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়। তার ফলে সেটা নানা অংশে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই প্রথম বিস্ফোরণের ফল স্বরূপ এই

তাহলে কী পৃথিবী থেকে ছায়াপথের নিকটতম অংশেই বেশী সংখ্যক নক্ষত্র সমাবিষ্ট? কেন?

বিজ্ঞানী হারসেল কিন্তু তা মনে করতেন না। তিনি ভেবেছিলেন যে মহাকাশে নক্ষত্র রাজি অসমভাবে বিরাজমান। সেখানে কোন সঠিক নিয়ম নেই। তথাপি কোন কোন দিকে একটি নক্ষত্র অন্য নক্ষত্র থেকে অনেক দূরে বিরাজমান।

অন্যভাবে বলা যায় যে, হারসেল ভাবেননি যে নক্ষত্ররাজি আকাশে যেন বাসকেট বলের মত গোলকের গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আমরা যেন এই বাসকেট বলের একদম কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছি। আমরা যেভাবেই দেখব সেভাবেই আমরা গোলকের চারিদিকে নক্ষত্র সমাবেশ দেখতে পাব। আমরা একই দূরত্বে একই সংখ্যক নক্ষত্র দেখতে পাব।

ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আমরা গোল পিঠা বা গোল রুটি দিয়ে তৈরী সমতল স্যান্ডউইচের মাঝখানে রয়েছি। আমাদের মাথার উপরের চারিদিকে স্যান্ডউইচের উপর দিকের গায়ে নক্ষত্ররা রয়েছে। তাহলে নক্ষত্র দেখতে হলে আমাদের অনেক দূরে তাকাতে হবে।

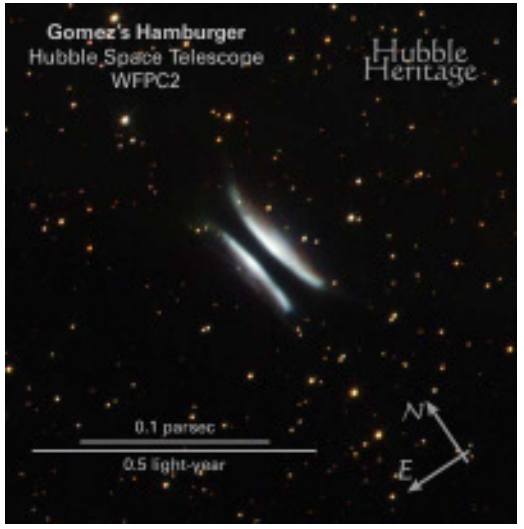

Hamburger Patty

এই অগুন্তি নক্ষত্র একত্রে সমবিষ্ট হয়ে একটা অনুজ্জ্বল কুয়াশার সৃষ্টি করেছে। এই স্যান্ডউইচ যদি গোলাকার হতো তাহলে এই সকল নক্ষত্ররা মিলিত হয়ে একটা বৃত্ত তৈরী করত। ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গা সেরকমই বৃত্ত তৈরী করেছে।

আবার আমরা স্যান্ডউইচে ফিরে আসি। স্যান্ডউইচের যে দিকটা সমতল সেদিকে আমরা কিছু সংখ্যক নক্ষত্র দেখতে পাব, কিন্তু কোনও আলোর কুয়াশা দেখতে পাব না।

মহাকাশের নক্ষত্র সমাবেশকে যদি স্যান্ডউইচের চেহারার সাথে তুলনা করা যায় তবে আমরা ছায়াপথের যত নিকটবর্তী হব নক্ষত্রদের তত ঘন সন্নিবিষ্ট বলে মনে হবে। বিজ্ঞানী হারসেল সেটাই দেখতে পেয়েছিলেন।

বিজ্ঞানী হারসেল অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, মহাকাশে নক্ষত্র সমাবেশ সেই রকমই গোল স্যান্ডউইচের মতো। এই নক্ষত্র সমাবেশকে ''ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গা বা স্বর্গ গঙ্গা'' নাম দেওয়া হয়। এই নাম করণ গ্রীক শব্দ ''গ্যালাক্সি'' ("the galaxy" - Gal-ak-see) অনুযায়ী করা হয়।

বিজ্ঞানী হারসেল এই ছায়াপথ কত বড় তা জানতেন না, কারণ নক্ষত্রদের দূরত্ব কত তা তিনি জানতেন না। তিনি দুটি নক্ষত্রের দূরত্ব কত সেটা একটা ধারনা করে ছায়াপথের বিশালত্ব সম্বন্ধে অনুমান করেছিলেন।

যখন নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়ে গেল , তখন বিজ্ঞানীরা আবার হারসেলের মতবাদ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলেন। তা থেকে দেখা গেল যে এই ছায়াপথ লম্বায় ৮,০০০ আলোক বর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর বিস্তার চওড়ায় ১,৫০০ আলোক বর্ষ। এই ছায়াপথে সম্ভবত ৩০০,০০০,০০০ (300,000,000) নক্ষত্রের সমাবেশ। (আমরা খালি চোখে আকাশে যে সংখ্যক নক্ষত্র দেখতে পাই তার প্রকৃত সংখ্যার ৫০,০০০ গুন বেশী নক্ষত্র এই ছায়াপথে বিদ্যমান।)

এখন প্রশ্ন হলো, এটাই কী ছায়াপথের সঠিক মান? এই ছায়াপথই কী সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে? তাই যদি হয়, তবে আমাদের এই মহাবিশ্ব বিশাল কিন্তু অসীম নয়।

সুতারাং আইনস্টাইনের প্রথম ''ক্ষেত্র সমীকরণ''টি পরিত্যাগ করতে হতো। এডিংটন আরও বললেন যে, আইনস্টাইনের এটা সবচাইতে বড় ভুল হয়েছিল।

আইনস্টাইনের ''ক্ষেত্র সমীকরণ'' ''হাবল্ সূত্র''র ব্যাখ্যা করেছিল। বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। ''ছায়াপথের সমাবেশ'' (clusters of galaxies) তাদের ''মাধ্যাকর্ষণ শক্তি''র (gravitational pull) জন্য একত্রিত থাকছে। কিন্তু অন্য ছায়াপথের সমাবেশ নিজেদের আলাদা রাখতে সমর্থ হচ্ছে। কারণ ব্রহ্মান্ড ক্রমবর্ধিত হচ্ছে এবং অন্য ছায়াপথ নিজেদের দূরে টেনে ধরে রাখছে।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, বিশ্ব ব্রহ্মান্ড চারিদিকে সমানভাবে বর্ধিত হচ্ছে তবে বিজ্ঞানী হাবল্ যা লক্ষ্য করেছিলেন সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। স্থানীয় দলভুক্ত ছায়াপথ ব্যতিত দূরবর্তী ছায়াপথ যত দূরে সরে যাচ্ছে তত তার অপসরণের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সমাধান আমাদের সৌরজগৎ কে কোন আলাদা বিশেষত্ব প্রদান করছে না। আমরা যদি মহাকাশের অন্য কোন ছায়াপথ থেকে দেখি তাহলেও আমরা একই ঘটনা দেখতে পাব। এটা এমন নয় যে এই ''ছায়াপথের সমাবেশ'' শুধু আমাদের থেকে সরে যাচ্ছে। এরা প্রত্যেকে নিজেদের থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে।

বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের এই ক্রমবর্ধমানতার প্রবণতা, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের তত্ত্ব ও হাবল্-এর সূত্র আমাদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে, এই মহাবিশ্বের প্রারম্ভ কীভাবে হয়েছিল এবং শেষ কী হবে।

—:—

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন হল্যান্ডের মহাকাশ বিজ্ঞানী উইলিয়ম ডি. সিট্টার (Willem de Sitter 1872-1934) বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই নতুন ''ক্ষেত্র সমীকরণ'' নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন যে, এই সমীকরণ অনুযায়ী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

বিজ্ঞানী সিট্টার তাঁর গবেষণায় এইভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কোন নক্ষত্র বা অন্য আর কোন বস্তু নেই। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে একজন রাশিয়ান গণিতবিদ্ আলেকজাণ্ডার এ. ফ্রেডম্যান (Alexander A. Friedman, 1888-1925) দেখালেন যে, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই ''ফিল্ড ইকুয়েশন''-এ যদি নক্ষত্রদেরও সামিল করা হয় তবেও দেখা যায় যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ক্রমবর্ধমান। ১৯৩০খ্রীষ্টাব্দে আর্থার এস এডিংটন (Arthur S Eddingtion, 1882 - 1944) নামে একজন ইংরেজ মহাকাশ বিজ্ঞানী দেখলেন যে, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ''ক্ষেত্র সমীকরণ'' অনুযায়ী বিশ্ব ব্রহ্মান্ড যদি স্তিতিশীল হতো, তবে তা আর চিরকাল স্তিতিশীল থাকত না। এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড হয় প্রসারিত হতো বা সঙ্কুচিত হতো এবং তা হতেই থাকত।

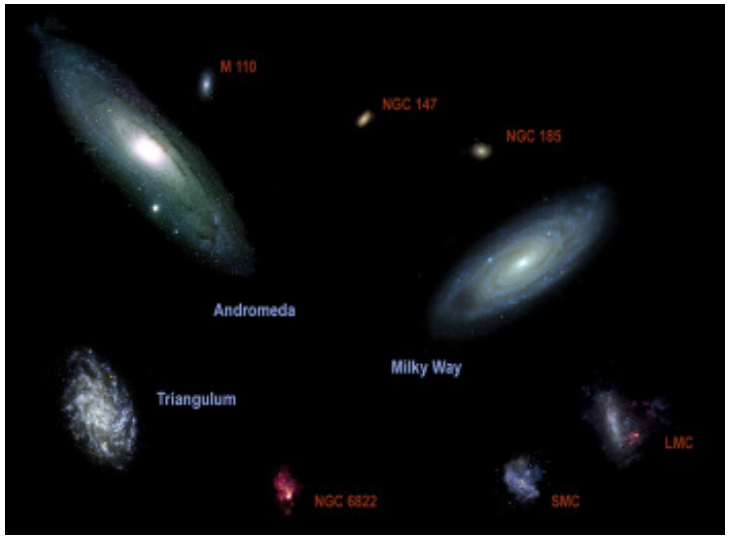

পরবর্তী মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ বিজ্ঞানী হারসেলের পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন। তাঁরা আরও উন্নত দূরবীণ এবং নতুন আবিষ্কৃত উন্নত ক্যামেরায় মহাকাশের ছবি তুলে সুস্পষ্টভাবে নক্ষত্র সংখ্যা নিরূপণ করতে পারছেন। তাদের আর হারসলের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্র গণনা করতে হয়নি।

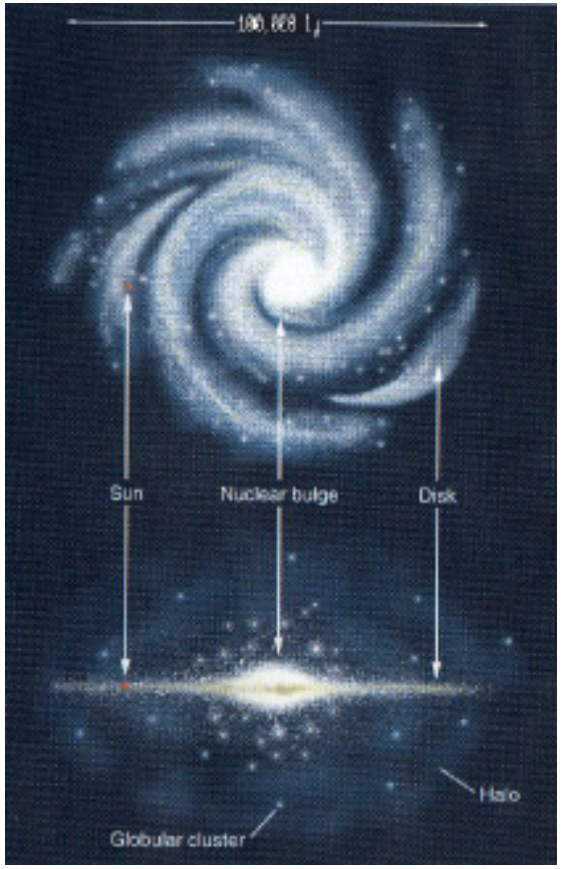

Top View and Side View of the Milky Way

তারা দেখতে পান যে, হারসলের ছায়াপথের আকৃতি সম্বন্ধে ধারনা সঠিক ছিল, কিন্তু ছায়াপথের বিশালত্ব সম্বন্ধীয় ধারনা সঠিক ছিল না। তাঁর ধারণার থেকে ছায়াপথ আরও অনেক বিশাল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের মহাকাশ বিজ্ঞানী জ্যাকোবাস (Jacobus C. Kapteyn - KAP- tin, 1851- 1922) নিরূপন করেন যে, এই ছায়াপথ লম্বায় ৫৫,০০০ আলোক বর্ষ (55,000 Light Years) এবং চওড়ায় ১১,০০০ আলোক বর্ষ (11,000 Light Years) হতে পারে।

বিজ্ঞানী হারসেল্ এবং জ্যাকোবাস দুজনেই বুঝেছিলেন যে, আমাদের সৌরজগৎ এই ছায়াপথের কেন্দ্রের খুব কাছে অবস্থিত। তাই আমরা ছায়াপথকে সব দিকেই সমান উজ্জ্বল দেখতে পাই। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে বোঝা যায় যে, আমাদের সৌরজগৎ ছায়াপথের কেন্দ্রে অবস্থিত নয়। কারণ ছায়াপথের কেন্দ্রে সহস্র নক্ষত্র সমাবিষ্ট হয়ে এক ''গোলাকার নক্ষত্র সমাবেশ'' তৈরী হয়েছে।

বিজ্ঞানী হারসেল নিজেই এই আবিষ্কারটি করেছিলেন। ছায়াপথে প্রায় একশটি এরকম নক্ষত্র সমাবেশ (Global clusfor) চিহ্নিত করা গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এই আবিষ্কারটি হয়েছিল।

এই ''গোলাকার নক্ষত্র সমাবেশ'' কেন পুরো ছায়াপথে ছড়িয়ে পরেনি তার কোন সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। যদি আমাদের সৌরজগৎ এই ''গোলাকার নক্ষত্র সমাবেশের'' অন্তর্ভূক্ত হত তবে আমরা আমাদের চারিদিকেই এই ''গোলাকার নক্ষত্র সমাবেশ'' দেখতে পেতাম।

কিন্তু আমরা তা দেখতে পাই না। এরকম এক একটি 'নক্ষত্র সমাবেশ' প্রায় অর্ধেক আকাশ জুড়ে থাকার কথা। কিন্তু এই 'নক্ষত্র সমাবেশের' মাত্র এক তৃতীয়াংশ আমরা ধনুরাশির নক্ষত্রপুঞ্জের (Constellation of Sagittarius - SAJ - ih - TAR - ee - us) মধ্যে দেখতে পাই। এই রকম অবস্থান কেন তা খুবই বিস্ময়কর।

১৯১২ (1912) খ্রীষ্টাব্দে হেনরীয়েটা সোয়ান লেভিট (Henrietta Swan Leavitt, LEV - it , 1868 - 1921) নামক একজন আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী 'সেফিড্জ' (Cepheids SEE - fee - idg) নামের একধরণের নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এই নক্ষত্রদের বিশেষত্ব এটাই যে, এরা নির্দিষ্ট সময় উজ্জ্বল থাকে আবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়। প্রত্যেক 'সেফিড্জ' নক্ষত্র নিজের নিজের নির্দিষ্ট সময়ে উজ্জ্বল থাকে ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানী 'লেভিট' লক্ষ্য করেছিলেন যে, বেশী উজ্জ্বল 'সেফিড্জ' নক্ষত্র বেশী সময় ধরে উজ্জ্বল থাকে, ফলে এই সকল 'সেফিড্জ' নক্ষত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 'প্যারালাক্স' পদ্ধতির সাহায্যে আরও দূরবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব।

উদাহরণ স্বরূপ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী দুটো 'সেফিড্জ' নক্ষত্রকে চিহ্নিত করলেন, যাঁরা একই সময় ধরে একই রকম উজ্জ্বল থাকে, তিনি তাদের একই দূরত্ব থেকে লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন যে, একটি নক্ষত্রকে অন্যটার থেকে বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তার কারণ উজ্জ্বল নক্ষত্রটির থেকে নিষ্প্রভ নক্ষত্রটি বেশি দূরত্বে অবস্থিত। যেমন আমরা রাস্তায় আমাদের কাছের আলোটিকে দূরের আলো অপেক্ষা বেশি উজ্জ্বল দেখি।

এই গতিবেগ সত্যই খুবই আশ্চর্যজনক। এর কী ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

বিজ্ঞানী হাবল্ নীহারিকার এই গতিবেগ নির্ধারণের কাজে অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন। তিনি সবরকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এইসব দূরবর্তী ছায়াপথের এই ক্রমবর্ধমান গতিবেগের পর্যানুক্রমিক হিসাব নির্ণয় করলেন। এইসব ছায়াপথের বর্ণালী বিচ্ছুরণের নিয়মও লক্ষ্য করলেন।

তিনি যখন এই কাজে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি আরও কিছু ব্যতিক্রমী জিনিস আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন যে, যে ছায়াপথ যত দূরে অবস্থিত তা তত দ্রুত গতিতে অপসৃত হচ্ছে। ছায়াপথের দূরত্ব যত বাড়ছে তার অপসরণের গতিবেগও একটি নির্দিষ্ট নিয়মে তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সূত্র আবিষ্কার করেন, একে 'হাবল্ সূত্র' (Hubble's Law) বলা হয়।

কিন্তু এইরকম ঘটনা কেন ঘটছে? স্থানীয় দলভুক্ত কয়েকটি ছায়াপথ ব্যতিত অন্য সব ছায়াপথ এত দ্রুত গতিতে অপসৃত হচ্ছে কেন? তাছাড়া এইসব ছায়াপথ আমাদের থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছে ততই তাদের গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করেন আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein–INE-stine, 1879-1955) নামক একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেন, তার নাম ''সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ'' (the General Theory of Relativity)। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কী নিয়ম অনুসরণ করে চলেছে তার একটা ব্যাখ্যা করেছেন। ''সমীকরণে''র (field equation) সাহায্যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থানের নিয়ম প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়েছেন।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে স্থিতিশীল বলে বিবেচনা করেছিলেন। ''Static—অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে যার কোন পরিবর্তন হয় না। সেই কারণে এই স্থিতিশীল জগৎকে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে তার জন্য তিনি এই ''ক্ষেত্র সমীকরণের'' কিছু নতুন ব্যাখ্যা সংযোজন করলেন।

পনেরোটি নীহারিকার বর্ণালীর বিশ্লেষণ করেছিলেন।

সেই কাজ করতে গিয়ে তিনি দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন তার বিশ্লেষিত নীহারিকার অর্ধ সংখ্যক নীহারিকা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে এবং বাকি অর্ধ সংখ্যক আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আদতে তা হয়নি। তবে সেটা কি ছিল? অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা এবং অন্য আর একটি নীহারিকা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল এবং বাকি তেরোটি নীহারিকা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো নীহারিকার অপসরণের গতি সংক্রান্ত। অপসৃত এই তেরোটি নীহারিকার অপসরণের গতির গড় মান ছিল প্রতি সেকেন্ডে ৪০০ মাইল। আমাদের জ্ঞাত অন্য নক্ষত্রের তুলনায় এই গতি অনেক বেশি।

অপসৃত নীহারিকার অপসরণের গতিবেগ সংক্রান্ত আরও অনেক গবেষণা করে বিজ্ঞানী স্লাইফার লক্ষ্য করলেন যে, এই অপসরণের গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানী হাবল্ গণনা করে দেখলেন যে, এইসব নীহারিকা অনেক দূরের ছায়াপথের মধ্যে অবস্থিত। মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ আশ্চর্য হলেন যে, যখন মহাকাশের অন্য সব মহাকাশীয় বস্তু এত ধীর গতিতে বিচরণ করছে তখন এইসব ছায়াপথগুলো কেন এত দ্রুত গতিতে অপসৃত হচ্ছে? তাছাড়া সবাই অপসৃত হচ্ছে কেন? যে দুটি ছায়াপথ এগিয়ে আসছে তারা স্থানীয় দলভুক্ত। স্থানীয় দলভুক্তের বাইরে যে সব ছায়াপথ আছে প্রত্যেকেই ব্যতিক্রমরহিত ভাবে অপসৃত হচ্ছে।

বিজ্ঞানী হাবল্-এর সাথে গবেষণারত বিজ্ঞানী ''মিলটন এল. হুমাসন'' (Milton L. Humason, HYOO-muh son, 1891-1972) এই সকল দূরবর্তী ছায়াপথের বর্ণালী নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি রাতের পর রাত এই সব অত্যন্ত নিষ্প্রভ ছায়াপথের আলোর বর্ণালীর ছবি তুলে তা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেখলেন যে, একটি নিষ্প্রভ ছায়াপথের অপসরণের গতিবেগ ২৪০০ মাইল প্রতি সেকেন্ডে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আর একটি অপসৃত ছায়াপথের গতি ২৫,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড নির্ণয় করলেন।

অবশ্য নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে এই কাজটি তত সহজ নয়। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের এই জন্য অনেক কঠিন হিসাব কষতে হয়েছিল। অবশেষে তাঁরা ভাবলেন, এই সেফিড্স নক্ষত্রদের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য অনেক দূরবর্তী নক্ষত্রদের দূরত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

একজন আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী হারলো সাপলে (Harlow shapley - SHAP - lee, 1885 - 1972) বিশেষ ভাবে এই 'সেফিড্জ' নক্ষত্রদের সাহায্যে দূরবর্তী নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ের কাজ করেছিলেন। তিনি গভীর ভাবে 'গোলাকার নক্ষত্র পুঞ্জকে' নিরিক্ষণ করে তার মধ্যে 'সেফিড্জ' তারকা চিহ্নিত করে তাদের উজ্জ্বলতা ও নিষ্প্রভতার সময়কাল নিরূপন করেছিলেন। 'সেফিড্জ' নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার সময়কাল নির্ধারণ করে তিনি দূরবর্তী ''গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জের'' দূরত্ব নির্ণয় করতে পেরেছিলেন।

এই সব ''গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ'' হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। এরা আকাশের কোন স্থানে অবস্থিত তাও জানা যায়। এই গোলাকার নক্ষত্রপুঞ্জ একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে একটি ঘন গোলক (Sphere around a center) তৈরী করেছে।

বিজ্ঞানী সাপ্লে স্থির বুঝলেন যে, এই নক্ষত্রপুঞ্জের ঘন গোলকের কেন্দ্রবিন্দু ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। তাই যদি হয় তবে ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দু আমাদের সৌরজগৎ থেকে অনেক দূরে ধনুরাশির নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে অবস্থিত। তাহলে সৌরজগৎ ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে বা তার কাছেও অবস্থিত নয়। এটি ছায়াপথের অনেক দূরের একধারে অবস্থিত।

তাই যদি হয়, তবে আমরা আকাশের চারিদিকে ছায়াপথকে একই রকম উজ্জ্বল দেখি কেন? কেন ধনুরাশির নক্ষত্রপুঞ্জের দিকের ছায়াপথকে বেশি উজ্জ্বল দেখি এবং তার বিপরীত আকাশে ছায়াপথকে নিষ্প্রভ দেখি? (সঠিক সত্য এই যে, ধনুরাশির দিকের ছায়াপথ অন্য দিকের তুলনায় বেশি উজ্জ্বল।)

তার কারণ এই যে, অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যবর্তী স্থান ধূলোর মেঘ এবং বায়বীয় গ্যাসে পরিপূর্ণ। দূরবীণ আবিষ্কারের পরই আমরা মহাকাশে এই ধরনের 'নাক্ষত্র

ধূলোর মেঘ' দেখতে পেলাম। ছায়াপথে এরকম অনেক মেঘ আছে যা সেখানে অবস্থিত নক্ষত্রের আলোর পথে বাধা হয়। তাই ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে আলো আমাদের কাছে কখনও পৌঁছায় না, আমরা ছায়াপথের যে দিকে অবস্থিত শুধু সেদিকটাই দেখতে পাই।

বিজ্ঞানী সাপ্‌লে এই বায়বীয় গ্যাসের ধারণাকে মেনে নিতে চাননি, কিন্তু পরবর্তীকালে একজন সুইস-আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার্ট জে. ট্রাম্পলার (Robert J. Trumpler - 1886 - 1956) প্রমান করলেন যে, দূরবর্তী নক্ষত্রদের শুধু মাত্র তাদের দূরত্ব আমাদের চোখে নিষ্প্রভ করে রাখে না। তিনি নিরূপন করতে সমর্থ হলেন যে, 'ছায়াপথ' লম্বায় ১০০,০০০ আলোক বর্ষ ও তার কেন্দ্রথেকে বিস্তৃতিতে ১৬,০০০ আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত।

আমাদের সৌরজগৎ 'ছায়াপথে'র কেন্দ্রবিন্দু থেকে ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত এবং ছায়াপথের নিকটতম কিনারা আমাদের সৌরজগৎ থেকে ২০,০০০ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। ছায়াপথ তার কেন্দ্রবিন্দুতে অতীব ঘন এবং কিনারার দিকে হালকা। ছায়াপথের যে স্থানে আমাদের সৌরজগৎ অবস্থিত সেখানে ছায়াপথের ঘনত্ব মাত্র ৩,০০০ আলোকবর্ষ।

সেফিড্‌স নক্ষত্রের সাহায্যে ছায়াপথের আয়তন সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হয়। বিজ্ঞানী জ্যাকোবাস কাপটেন 'ছায়াপথ' সম্বন্ধে যে ধারনা করেছিলেন তার থেকে 'ছায়াপথ' আরও অনেক অনেক বড়ো। অবশেষে এখন জানা যায় যে, ছায়াপথে সম্ভবতঃ ৩০০,০০০,০০০,০০০ (Three hundred billion) নক্ষত্রের সমাহার। তার ৮০ শতাংশই আমাদের সূর্যের থেকে ছোট। যদি ধরে নেওয়া যায় যে 'ছায়াপথে'র সব নক্ষত্রই সূর্যের সমান আয়তনের তাহলেও 'ছায়াপথে' ১০০,০০০,০০০,০০০ (One hundred billion) নক্ষত্র অবস্থিত।

—:—

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন ব্রিটিশ মহাকাশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হাগিন্‌স (William Huggins, 1824-1910) সিরিয়াস (Sirius) নক্ষত্র থেকে বিচ্ছুরিত নিষ্প্রভ আলোর বর্ণালী তৈরী করতে পেরেছিলেন। তিনি সেই বর্ণালীতে নিষ্প্রভ লাল আলোর দিকে একটা সূক্ষ্ম অপসরণ লক্ষ্য করেছিলেন। তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে 'সিরিয়াস' নক্ষত্র আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বর্তমান উন্নততম গণনায় জানা যায় যে ''সিরিয়াস'' নক্ষত্র সেকেন্ডে ৫ মাইল গতিতে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অতঃপর বিভিন্ন মহাকাশ বিজ্ঞানী বিভিন্ন নক্ষত্রের এই আলোর বর্ণালীর সাহায্যে গণনা করতে সক্ষম হচ্ছেন যে, কোন্ নক্ষত্র কত গতিতে আমাদের দিকে আসছে বা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সেটা গণনা করে বিজ্ঞানীগণ বিস্মিত হননি। কারণ যে গতিতে নক্ষত্ররা বিচরণ করছে তা সেকেন্ডে ৫ মাইল থেকে ৭০ মাইল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভেস্টো এম. স্লাইফার (Vesto M. Slipher, SLY-fer, 1875-1969) নামে একজন আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী ''অ্যানড্রোমেডা ছায়াপথে''র আলোর বর্ণালী নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন। সেই সময়ে ''অ্যানড্রোমেডা'' প্রকৃতপক্ষে ছায়াপথ কি না তা সঠিকভাবে নির্ণয় হয়েছিল না। ''অ্যানড্রোমেডা''কে তখন শুধুমাত্র ধূলোর মেঘ আর বায়বীয় গ্যাসের সংমিশ্রণ বলে ধরা হয়েছিলো।

সেই সময় সূর্যের আলো বা নক্ষত্রের আলোর মত ''অ্যানড্রোমেডা''র আলোর নিষ্প্রভ বর্ণালীর মধ্যে কালো রেখা দেখা গিয়েছিল। বিজ্ঞানী স্লাইফার দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, ''অ্যানড্রোমেডা''র বর্ণালীর কালো রেখা বেগুনি রঙের দিকে সরে যাচ্ছে। তাতে প্রমাণ হয় যে, ''অ্যানড্রোমেডা ছায়াপথ'' প্রতি সেকেন্ডে ১২০ মাইল গতিতে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে। এই গতি অন্যান্য নক্ষত্রের গতির চাইতে সামান্য বেশি। কিন্তু অনেক নক্ষত্রই তত তাড়াতাড়ি গমন করে না। তাই বিজ্ঞানী স্লাইফার তাঁর প্রাপ্ত হিসাব নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না।

অতঃপর বিজ্ঞানী স্লাইফার আরও অন্য নীহারিকার বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এই ধরণের কালো রেখার অবস্থান নিরূপণ করেছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি

বর্ণালী রেখার এই অপসরণকে ''ডপ্‌লার-ফিজু প্রভাব'' (Doppler-Fizeau effect) বলা হয়। এটা প্রথম ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী ক্রিস্চিয়ান জে. ডপলার (Christian J. Doppler–DOP-ler, 1803-53) ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এই ব্যাখ্যা করেছিলেন। এর পরেই ফরাসী বিজ্ঞানী ''আরমান্ড এইচ. এল. ফিজু (Armand H. L. Fizeau–fee ZOH, 1819-96) প্রমাণ করলেন যে এই ব্যাখ্যা আলোর তরঙ্গের জন্যেও করা যায়।

এই ব্যাখ্যার সাহায্যে নক্ষত্রের আলোরও ব্যাখ্যা সম্ভব। নক্ষত্রের আলোর ও কালো রেখা সমেত বর্ণালী বিচ্ছুরণ সম্ভব। মহাকাশ গবেষকগণ গবেষণা করে ব্যাখ্যা করলেন যে, কোন আলোর উৎসের জন্য বর্ণালীর মধ্যে এই কালো রেখা কোথায় থাকা সঙ্গত। যদি কোন নক্ষত্রের বর্ণালীর এই কালো রেখা বেগুনি রঙের দিকে সামান্যতম সরে যায় তবে বোঝা যাবে যে, নক্ষত্রটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তেমনই কোন নক্ষত্রের বর্ণালীর এই কালো রেখা লাল রঙের দিকে সামান্যতম সরে যায় তবে বোঝা যায় নক্ষত্রটি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বা 'অপসৃত' হচ্ছে। নক্ষত্রের আলোর এই সরে যাওয়া থেকে হিসাব করা যাবে যে, নক্ষত্রটি কত গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে বা দূরে সরে যাচ্ছে।

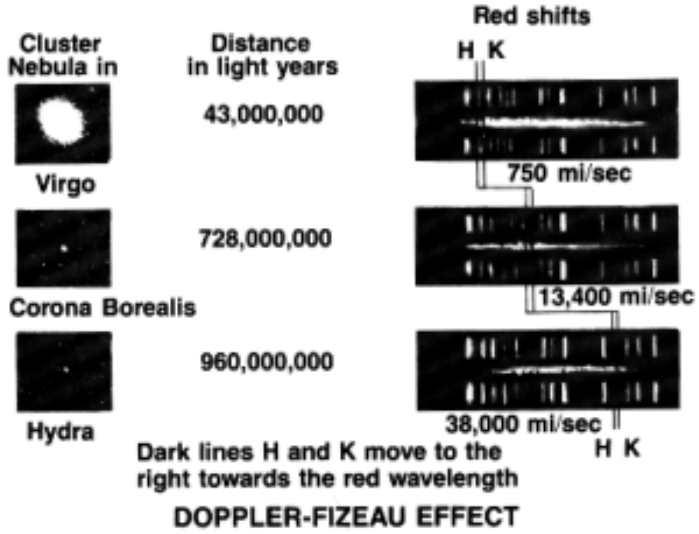

DOPPLER-FIZEAU EFFECT

৩ অপরাপর ছায়াপথ (The Other Galaxies)

বিজ্ঞানী হারসেলের ছায়াপথ সম্বন্ধে ধারণার দেড়শো বছর পরেও অপর মহাকাশ বিজ্ঞানীরাও তাঁর সঙ্গে সহমত ছিলেন। তাঁরা ছায়াপথের পরিধি সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু ছায়াপথের আকৃতি যাই হোক তা সমগ্র মহাকাশে ব্যাপৃত ভেবেছিলেন। অন্ততঃ দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিজ্ঞানীদের ছায়াপথের বাইরে আর কিছু দেখাতে পারেনি।

কিন্তু তার মধ্যে একটি ব্যতিক্রম ছিল। সুদূর দক্ষিণ আকাশে দুটো 'আলোর মেঘ' দেখা যায়। যাদের দেখে মনে হয়েছিল যে, তারা ছায়াপথের ভগ্নাংশ। তাদের নাম দেওয়া হয় ''ম্যাজেলানিক মেঘ'' (Magellanic clouds - MAJ - uh - LAN-ik)। পর্তুগিজ নাবিক 'ফারদিনান্দ ম্যাজেলান' কে সম্মান জানিয়ে এই নামকরণ করা হয়েছিল (Ferdinand Magellan - Muh - JEL - an, 1480 - 1522)।

ম্যাজেলান তাঁর প্রথমবার পৃথিবী পরিক্রমাকালে জাহাজ থেকে এই 'আলোর মেঘ' দেখেছিলেন। তিনিই প্রথম ইউরোপীয় যিনি এই 'আলোর মেঘ' দেখেছিলেন। এই 'আলোর মেঘ' আকাশের অতি দক্ষিণে। দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব দক্ষিণে অবস্থান কালে তিনি এটা দেখেছিলেন। এই 'আলোর মেঘ' এতটাই দক্ষিণ আকাশে অবস্থিত যে, উত্তর গোলার্ধের কোনও মহাদেশ বা ইউরোপ থেকে তা দেখা যায় না।

এই ''ম্যাজেলানিক মেঘ'' কে যদি দূরবীণের সাহায্যে অতি গভীর ভাবে নিরিক্ষণ করা যায় তবে দেখা যায় যে, ছায়াপথের মতই অনেক নিষ্প্রভ নক্ষত্রের সমাবেশে এই 'আলোর মেঘ' তৈরী হয়েছে। এই 'আলোর মেঘেও' কিছু 'সেফিড্‌স' জাতীয় নক্ষত্র আছে। বিজ্ঞানী 'লেভিট্‌স' এই 'ম্যাজেলানিক মেঘ' ও 'সেফিড্‌স' জাতীয় নক্ষত্র নিয়েই গবেষণা করে দেখেছিলেন যে, যে সকল 'সেফিড্‌স' নক্ষত্র যত উজ্জ্বল

তারা তত অধিক সময় পর্যন্ত উজ্জ্বল থাকে অর্থাৎ তাদের উজ্জ্বল থাকার সময়কাল অধিক।

এই সকল 'সেফিড্স' নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীগণ জানতে পারেন যে, এই দুটি 'ম্যাজেলানিক মেঘে'র মধ্যে বড়টি ১৫৫,০০০ আলোকবর্ষ (155,000 Light Year) দূরত্বে ও ছোটটি ১৬৫,০০০ আলোকবর্ষ (165,000 Light Year) দূরত্বে অবস্থিত।

এই 'ম্যাজেলানিক মেঘ' দুটি আমাদের 'ছায়াপথে'র অর্ন্তগত নয়, এরা আমাদের 'ছায়াপথ' থেকে অনেক ছোট। এদের মধ্যে বড় মেঘটিতে ১০,০০০,০০০,০০০ (ten billion) একশ কোটি এবং ছোটটিতে মাত্র ২,০০০,০০০,০০০ (two billion) ২০ কোটি নক্ষত্র বিদ্যমান। এই দুটি মেঘকে একসাথে ধরে হিসাব করলেও তা আমাদের ছায়াপথের নক্ষত্র সংখ্যার কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাত্র হবে।

তাহলে হয়তো এই নিখিল বিশ্ব আমাদের ছায়াপথ এবং এই দুটি ছোট ছায়াপথ নিয়েই গঠিত।

এতদ্ সত্ত্বেও আরও একটি বস্তু বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করছিল। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে একজন জার্মান বিজ্ঞানী সাইমন মারিয়াস (Simon Marius, 1570 - 1624) একটি ক্ষুদ্র নিষ্প্রভ আলোক বর্তিকা উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রপুঞ্জে (constellation Andromeda an - DROM - uh - duh) দেখতে পেয়েছিলেন। ল্যাটিন শব্দ ''nebula'' (NEB - yoo - luh) অর্থাৎ 'মেঘ' (Cloud)এর নামকরণ হয়েছিল। আকাশে এর অবস্থান নিরূপন করে এর নামকরণ হয় ''অ্যানড্রোমেডা নেবুলা'' (Andromeda Nebula)।

* [Nebula - misty appearance in the sky made by a group of stars or gaseous matter - নীহারিকা।]

বেশির ভাগ মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন যে, এই নীহারিকাটি ধুলো এবং গ্যাসের সমাহারে তৈরী হয়েছে। এই ধরণের নীহারিকা থেকে কখনও কখনও আলোর বিচ্ছুরণ হয়, কারণ এর মধ্যে নক্ষত্রও থাকে। আদতে কিছু বিজ্ঞানী

কোন আলোর উৎস যখন আমাদের দিকে এগিয়ে আসে তখন আমরা যে আলোক রশ্মি দেখতে পাই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যায়। ফলে বর্ণালী রেখা বেগুনি রঙের দিকে সরে যায়। এই অপসরণকে ''বেগুনি অপসরণ'' (violet shift) বলে। যখন আলোর উৎস আমাদের থেকে দূরে সরে যায় তখন আমরা যে আলোক রশ্মি দেখতে পাই তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হয়ে যায় তখন বর্ণালীরেখা লাল রঙের দিকে সরে যায়। এই অপসরণকে ''লাল অপসরণ'' (red shift) বলা হয়।

SPECTRA OF THE SUN AND SIRIUS

৪ অপসৃত ছায়াপথ
(The Receding Galaxies)

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কী চিরকাল বিদ্যমান ছিল? এটা কি আবহমানকাল বিরাজিত থাকবে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আলোক সম্বন্ধীয় আবিষ্কারের উপর নির্ভরশীল।

সূর্য-রশ্মি নানা মাপের ছোট ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিয়ে গঠিত। সূর্য-রশ্মিকে কাঁচের ''প্রিজম''-এর (prism-PRIZ-um) মধ্য দিয়ে প্রবেশ করালে আলোক রশ্মি অবনমিত ও বিচ্ছুরিত হয়। বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর কম অবনমন হয় এবং ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেশি অবনমন হয়। ফলে একগুচ্ছ আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। সেখানে একদিকে সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং অন্যদিকে সবচেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ভাগ হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় স্পেকট্রাম (spectrum-SPEK-trum) বা আলোর বিচ্ছুরণ। [Prism-a solid whose ends are similar equal and parallel polygons — সদৃশ সমান ও সমান্তরাল বহুভুজ প্রান্তযুক্ত বা পার্শ্বযুক্ত ঘনক]

বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো আমাদের চোখে বিভিন্ন রঙ দেখায়। তাই এই আলোর বিচ্ছুরণ বা বর্ণালী রঙের রামধনু হয়ে প্রতিভাত হয়। লাল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি তাই সেটা নীচের দিক থেকে প্রথমে থাকে, তারপর কমলা (orange), হলুদ (yellow), সবুজ (green), নীল (blue), ঘন নীল (indigo), বেগুনি (violet)। বেগুনির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। [VIBGYOR]

সূর্যরশ্মিতে কয়েকটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মনে হয় যেন হারিয়ে গেছে। তাই বর্ণালীর কিছু স্থানে কোন রঙ থাকে না। সূর্য রশ্মির বর্ণালীতে কয়েকটি কালো রেখা পাওয়া যায়, তাকে ''স্পেকট্রাম লাইন'' বলা হয়। সূর্য রশ্মির বর্ণালীতে এরকম কয়েক হাজার রেখা দেখা যায়।

অন্য আলোর উৎস থেকেও এইরকম বর্ণালী পাওয়া যায় তবে তা অন্যরকম স্পেকট্রাম লাইন দিয়ে তৈরী হয়।

ভেবেছিলেন যে, এই নীহারিকার মধ্যে শুধু ধূলোর মেঘও বায়বীয় গ্যাস আছে যা নিজেদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে একটি নক্ষত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। যেহেতু ওই নীহারিকা একটি নক্ষত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে তাই সে আলোক বিচ্ছুরণ ও করছে।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী পিয়ের ডি লাপলাস (Pierre de Laplace,- lah - PLAHS, 1749 - 1827) ধারণা করেছিলেন যে, আমাদের সৌরজগৎ ও এইরকম এক বিশালাকার ঘূর্ণায়মান মেঘ ও বায়বীয় গ্যাস দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। ''অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা'' তত্ত্বকে মেনে নিয়ে এই তত্ত্বকে ''নেবুলার হাইপোথেসিস'' (Nebular hypothesis - hy - POTH - uh - sis) বলা হয়।

Andromeda Galaxy

এখানে একটা প্রশ্ন আছে। কিন্তু অন্যসব নীহারিকা—যার ভেতরের নক্ষত্র তার ধূলো ও গ্যাসকে আলোকিত করে তারা খুব কম সংখ্যক আলোর তরঙ্গ বিচ্ছুরণ করতে সমর্থ হয়। (আলো বিভিন্ন মাত্রার ছোট ছোট তরঙ্গের মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হয়)। কিন্তু এই ''অ্যানড্রোমেডা'' নীহারিকা নক্ষত্রের মতই বিভিন্ন মাত্রার আলোক-তরঙ্গ বিচ্ছুরণ করতে পারে। এই নীহারিকার বিচ্ছুরিত আলোকে নক্ষত্রের আলোর মতই মনে হয়। সত্যই কি এই মেঘ তবে নক্ষত্র দিয়ে তৈরী হয়েছে?

এই তথ্যের সমস্যা এটাই হলো যে, এই নীহারিকার মধ্যে কোন নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এটাকে শুধুই নিষ্প্রভ সাদা আলোর কুয়াশা বলে মনে হয়।

অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা থেকে কখনও খুবই নিষ্প্রভ তারার মতো ছোট ছোট আলোর বিন্দু দেখা যায় যা আবার অল্প পরেই নিষ্প্রভ হয়ে মিলিয়ে যায়।

মহাকাশে অবশ্য তাৎক্ষনিক উজ্জ্বল আলোকিত নক্ষত্রও দেখা যায়। কখনও কখনও এইসব নক্ষত্র সহসা উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরণ করে আবার প্রথামত নিষ্প্রভ হয়ে যায়। যদি কোন নক্ষত্র সাধারণতঃ অতি নিষ্প্রভ থাকে তারা তাদের উজ্জ্বলতার মুহূর্তে দৃশ্যমান হয় এবং আবার নিষ্প্রভ হয়ে অদেখা হয়ে যায়। দূরবীণ আবিষ্কারের পূর্বে এইধরনের নক্ষত্র যারা কখনও দৃশ্যমান হয় আবার অদৃশ্য হয়ে যায় তাদের ল্যাটিন শব্দ অনুযায়ী ''নভো স্টেলা'' (Navae stellae) অর্থাৎ ''নতুন নক্ষত্র'' বলা হতো। এখন এদের সংক্ষেপে ''নভো'' (Navae) বলা হয়।

একজন আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী হারবার ডিকারটিস (Herber D. Curtis, 1872 - 1942) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই 'নভো' নক্ষত্রদের নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি বলেন যে, এই সকল ''নভো'' নক্ষত্র মহাকাশে যদি কোনও নীহারিকার সামনে দৃশ্যমান হয় তবে তারা আরও অন্যান্য দিকেও আলোক বিচ্ছুরণ করে, অন্ততঃ আরও কয়েকদিকে।

কিন্তু অ্যানড্রোমেডা নীহারিকার ক্ষেত্রে তা হয় না। এই নীহারিকার সামনে অনেক ''নভো'' নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়। (এখন পর্যন্ত প্রায় একশোটি এরকম নক্ষত্র শনাক্ত করা গেছে।) আকাশের একটি ছোট অংশে এরকম ঘটনা হচ্ছে। তার মানে শুধু এই নয় যে, এই অ্যানড্রোমেডা নীহারিকাটি অত্যাশ্চর্য, মূল কারণ হলো এই ''নভো'' নক্ষত্রগুলি এই নীহারিকার ভিতরেই দৃশ্যমান হচ্ছে। তাই অ্যানড্রোমেডা নীহারিকাটি অত্যাশ্চর্য।

আর একটি বিশেষত্ব হলো যে, যে সকল 'নভো' নক্ষত্র এই অ্যানড্রোমেডা নীহারিকার মধ্যে বিদ্যমান, তারা অন্য জায়গার ''নভো'' নক্ষত্রের তুলনায় অনেক

'আকাশ-গঙ্গা ছায়াপথ', 'অ্যানড্রোমেডা ছায়াপথ' 'ম্যাজেলানিক মেঘ' [যাকে এখন দুটো 'বামন ছায়াপথ' (dwarf galaxies)] বলা হয়। এরকম দুই ডজন (dozen) আরও বামন ছায়াপথ নিয়ে 'সন্নিবিষ্ট ছায়াপথ' তৈরী হয়েছে, যাকে 'লোকাল গ্রুপ' (local group) 'স্থানীয় দল' বলা হয়।

এইভাবে বিজ্ঞানীরা লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ আবিষ্কার করেছেন যারা প্রত্যেকে নক্ষত্র সমাবেশ অনুযায়ী (clusters) ভাগ হয়েছে। এইরকম নক্ষত্র সমাবেশ এত বড় যে তাতে হাজার হাজার ছায়াপথের সমাবেশ দেখা যায়। সবচাইতে দূরের যে ছায়াপথ আমরা দেখতে পাই তা কয়েক হাজার লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। কাজেই যে আলোর সাহায্যে আমরা এই সকল 'ছায়াপথ' দেখতে পাই তা কয়েকশো হাজার বছর আগে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল। অথচ একমাত্র আমাদের পৃথিবীতেই প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে, এমনকি অনেক সরল আনুবীক্ষণিক প্রাণীও এখানে আছে।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা 'কোয়াসার' (KWAY-zarz) আবিষ্কার করেন। কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন যে এগুলো বহু বহু দূরবর্তী ছায়াপথ। তারা এত দূরে অবস্থিত যে তাদের শুধুমাত্র উজ্জ্বল মধ্যস্থল দৃষ্টিগোচর হয়। এই কারণে 'কোয়াসার'কে নিষ্প্রভ নক্ষত্র বলে মনে করা হয়। এরা কয়েক সহস্র কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। সবচাইতে দূরের যে 'কোয়াসারটি' এখন পর্যন্ত দেখা গেছে সেটা একশ কোটি আলোকবর্ষ (10,000,000,000 ten billion) দূরে অবস্থিত।

দূরবর্তী ছায়াপথ যা আমরা দেখতে পাই না তার সংখ্যা এক হাজার কোটি (100,000,000,000 a hundred billion) হবে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড তার থেকে আড়াইশো কোটি (25,000,000,000 billion) আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। এই বিপুল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের আকাশ গঙ্গা ছায়াপথ যেন একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শষ্যকণা।

—:—

বেশি নিষ্প্রভ। তবে কি 'অ্যানড্রোমেডা নভো' নক্ষত্ররা আরও অনেক বেশি দূরত্বে অবস্থিত? ছায়াপথের অন্য কিছু থেকে আরও দূরে? তাই যদি হয়, তবে 'অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা' নক্ষত্র সমাবেশেই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই নীহারিকা এত বেশি দূরত্বে অবস্থিত যে, সেখানে অবস্থিত 'নোভা' নক্ষত্রদের আলাদা করে নির্ধারন করা যায় না।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ''অ্যানড্রোমেডা নীহারিকায়'' একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল 'নোভা' নক্ষত্র দৃশ্যমান হয় যা অন্যান্য 'নোভা' নক্ষত্র অপেক্ষা অনেক বেশি উজ্জ্বল। এই নক্ষত্রটি এতটাই উজ্জ্বল যে দূরবীণ ছাড়াও এটিকে দেখা যেত। এই নক্ষত্রটিও কি এই নীহারিকার অংশ?

মহাকাশের অপর অংশেও সাধারণ 'নোভা' নক্ষত্রের তুলনায় অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা গিয়েছিল। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে এইরকম একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র মহাকাশে দৃশ্যমান হয়েছিলো। সেই 'নোভা' নক্ষত্রটি শুক্র গ্রহ (mars) অপেক্ষা উজ্জ্বল ছিলো, কিন্তু তারপর নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সুইজারল্যাণ্ডের মহাকাশ বিজ্ঞানী ফ্রীট্জ জুইকি (Fritz Zwicky, 1898 - 1974) এইসকল অসাধারণ উজ্জ্বল নক্ষত্রের নামকরণ করেন ''সুপার নোভা'' (super novas)

একটি ''সুপার নোভা'' নক্ষত্র খুব কম সময়ের জন্য হলেও সাধারণ নক্ষত্রের ১০০,০০০,০০০,০০০ (a hundred billion) এক হাজার কোটি গুণ উজ্জ্বলতর হয়। তাহলে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানড্রোমেডা নীহারিকায় দৃশ্যমান উজ্জ্বল নক্ষত্রটি কী ''সুপার নোভা''? স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এইটিই উজ্জ্বলতম নোভা নক্ষত্র ছিল।

কিন্তু তাহলে অ্যানড্রোমেডা নীহারিকায় 'সুপার নোভা' নক্ষত্রটি কেন এত নিষ্প্রভ হয়ে গেলো যে দূরবীণ ছাড়া তাকে আর দেখা গেলো না? অথচ ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে দেখতে পাওয়া 'সুপার নোভা' নক্ষত্রটি শুক্র গ্রহের চেয়ে অধিক উজ্জ্বলতর ছিল। বিজ্ঞানী কারটিস (Curtis) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে দেখতে পাওয়া 'সুপার নোভা' নক্ষত্রটি আমাদের অনেক নিকটে ছিল। কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেখতে পাওয়া অ্যানড্রোমেডা নীহারিকার নক্ষত্রটি আমাদের থেকে অনেক দূরে ছিল।

অনেক বছর ধরে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বিমত ছিল যে, 'অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা' আমাদের ছায়াপথের মধ্যে বিদ্যমান না কি তার অনেক দূরে অবস্থিত।

অতঃপর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা উন্নত দূরবীণ ব্যবহার করা হলো। সেটা সেই সময় নির্মিত সবচেয়ে বড়ো ও ভালো দূরবীণ। এই দূরবীণে একটা ১০০ ইঞ্চি লম্বা আয়না ছিল। আমেরিকার এডুইন পি. হাবল (P. Hubble 1889-1953) নামক এক মহাকাশ বিজ্ঞানী এই দূরবীণের সাহায্যে ছবি তুলে দেখিয়েছিলেন যে, 'অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা' অজস্র ছোট ছোট নক্ষত্রের সমাবেশে তৈরী হয়েছে।

বিজ্ঞানী কারটিসের পর্যবেক্ষণ সঠিক ছিল—অ্যানড্রোমেডা নীহারিকা সত্যই বহু দূরে অবস্থিত।

এটা সত্যই একটা অন্য ছায়াপথ, যা আমাদের ছায়াপথের চাইতে বড়। তাই একে 'অ্যানড্রোমেডা ছায়াপথ' বলা হয়। 'সেফিড্স নক্ষত্র' এই 'অ্যানড্রোমেডা ছায়াপথে' তৈরী হয় এবং তাদের আপাত উজ্জ্বলতার সময়কাল নিরিক্ষণ করে এই নতুন ছায়াপথের দূরত্ব পরিমাপ করা হয়।

প্রথমে এই 'অ্যানড্রোমেডা ছায়াপথে'র পৃথিবী থেকে দূরত্ব কম মনে হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে এক জার্মান-আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী ওয়ালটার বাডে (Walter Badde - BAH duh, 1893-1960) দেখালেন যে, সেখানে দুধরণের 'সেফিড্স' নক্ষত্র আছে। ফলে সঠিক দূরত্ব নির্ধারণ হল এবং জানা গেল যে 'অ্যানড্রোমেডা ছায়াপথ ২,৩০০,০০০ আলোকবর্ষ (2,300,000 light year) দূরত্বে অবস্থিত। এটা 'ম্যাজেলানিক মেঘ' থেকে ১৫ গুণ দূরত্বে অবস্থিত এবং আমাদের ছায়াপথে যত নক্ষত্র আছে তার দ্বিগুণ নক্ষত্র এই 'অ্যানড্রোমেডা ছায়াপথে' আছে।

যখন জানা হয়ে গেলো যে 'অ্যানড্রোমেডা ছায়াপথ' একটা অন্য ছায়াপথ তখন এইরকম আরও অনেক ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেল। আমাদের ছায়াপথ ও তার মধ্যে একটি। আমাদের ছায়াপথকে আলাদাভাবে বোঝার জন্য তাকে 'Milky way' বা আকাশ গঙ্গা বা স্বর্গ-গঙ্গা নাম দেওয়া হল।

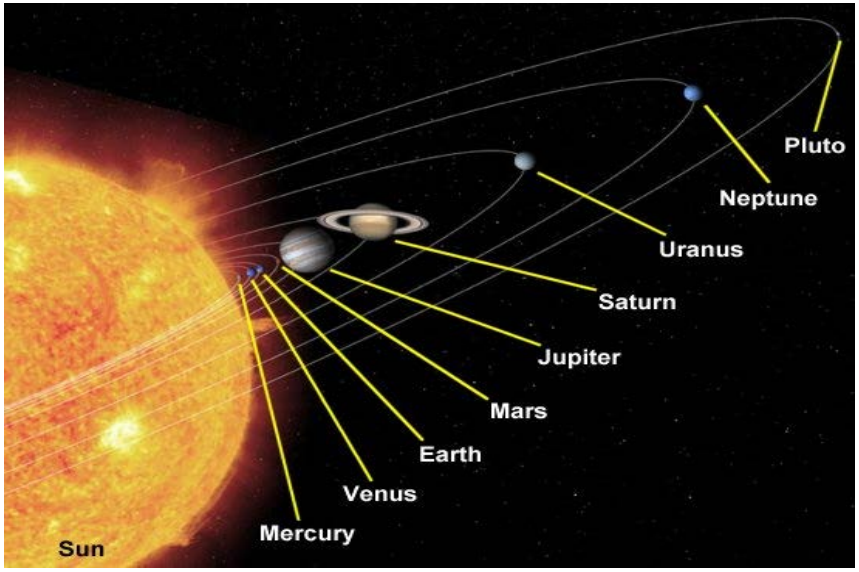
Pluto
Neptune
Uranus
Saturn
Jupiter
Mars
Earth
Venus
Mercury
Sun

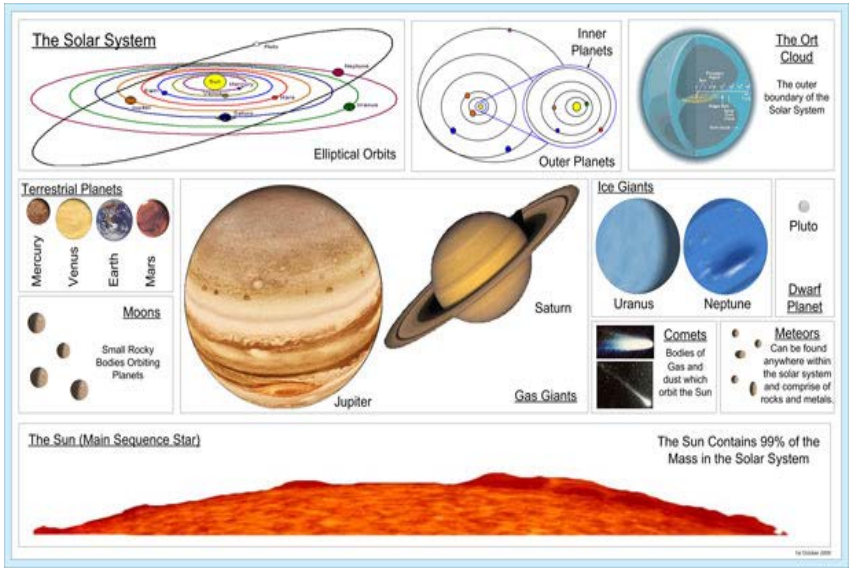
The Solar System
Elliptical Orbits
Inner Planets
Outer Planets
The Ort Cloud
The outer boundary of the Solar System
Terrestrial Planets
Mercury
Venus
Earth
Mars
Moons
Small Rocky Bodies Orbiting Planets
Jupiter
Saturn
Gas Giants
Ice Giants
Uranus
Neptune
Pluto
Dwarf Planet
Comets
Bodies of Gas and dust which orbit the Sun
Meteors
Can be found anywhere within the solar system and comprise of rocks and metals
The Sun (Main Sequence Star)
The Sun Contains 99% of the Mass in the Solar System

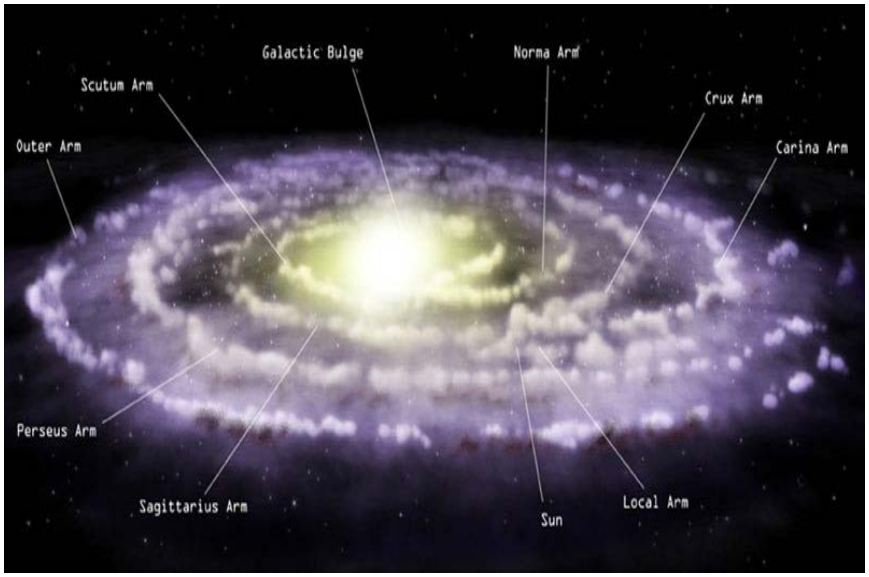
Galactic Bulge
Norma Arm
Scutum Arm
Crux Arm
Outer Arm
Carina Arm
Perseus Arm
Sagittarius Arm
Sun
Local Arm

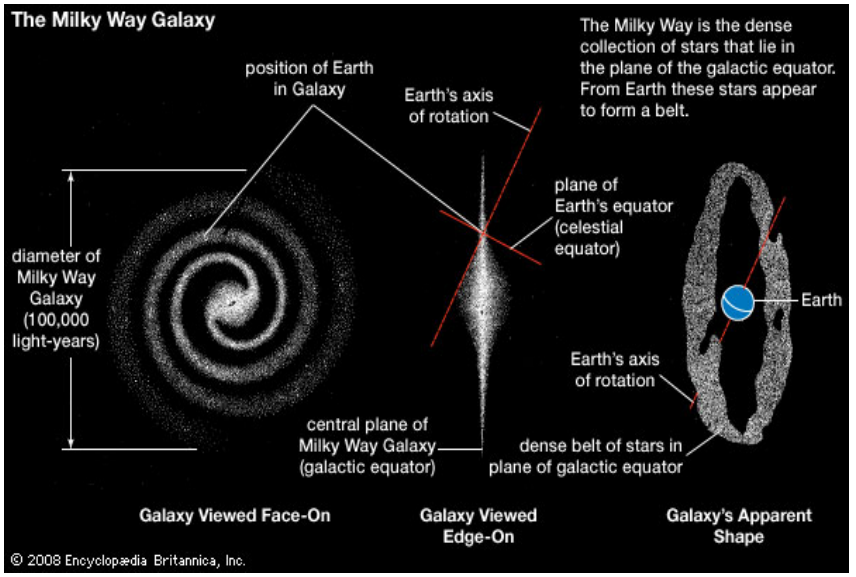
The Milky Way Galaxy
The Milky Way is the dense collection of stars that lie in the plane of the galactic equator. From Earth these stars appear to form a belt.
position of Earth in Galaxy
Earth's axis of rotation
plane of Earth's equator (celestial equator)
diameter of Milky Way Galaxy (100,000 light-years)
Earth
Earth's axis of rotation
central plane of Milky Way Galaxy (galactic equator)
dense belt of stars in plane of galactic equator
Galaxy Viewed Face-On
Galaxy Viewed Edge-On
Galaxy's Apparent Shape
© 2008 Encyclopædia Britannica, Inc.